ধারাবাহিক রচনা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥১২

—সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞান বা মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় তদনুকূল সাধনপ্রণালীর আলোচনা ও তার সাধনে প্রবৃত্তি—অর্থাৎ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোক অবধি যা ব্যাখ্যাত হয়েছে তা হল জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন, এর বিপরীত যা কিছু তা সবই অজ্ঞান।

অষ্টম শ্লোক থেকে শ্রীভগবান জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন ও জ্ঞানীর লক্ষণ সম্বন্ধে যে-বর্ণনা শুরু করেছিলেন, এই শ্লোকে তারই উপসংহার করেছেন। এর পূর্বের শ্লোকে তিনি বলেছেন, যে-মুমুক্ষু সাধক পরম জ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, গতি ও আশ্রয় ঈশ্বর। তাঁকে তাঁর লক্ষ্যে সংশয়াতীত হয়ে স্থির ও অটল থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রতিনিয়ত আত্মা, অনাত্মা, সদসৎ বস্তুবিচার করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন, ''পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।'' অর্থাৎ সাধক সর্বদা অনিত্যকে সরিয়ে নিত্যের (ঈশ্বরের) প্রতি মন স্থির রাখবে। কম্পাসের কাঁটার মতো সাধকের মনও একান্তে অথবা লোকব্যবহারকালে বা কর্মের সময় ক্ষণেকের জন্য অন্যদিকে গেলেও মুহূর্তেই যেন তা বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে ঈশ্বর বা পরব্রহ্মরূপ লক্ষ্যের দিকে স্থির থাকে। এইরূপে বিবেকবিচারের সাহায্যে লক্ষ্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হলে, সাধক একনিষ্ঠ একাগ্র চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সকল তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য সাধনায় যত্নবান ও নিবিষ্টচিত্ত হতে পারবেন।

এই জ্ঞানলাভের ফল মোক্ষ বা সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি তথা পরম শান্তি। শ্রুতি বলেন, ''আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ''—আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি করতে হবে। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত যা বর্ণনা করেছেন সেসবই মোক্ষলাভের সাধন। এগুলির বিপরীত বা বিরুদ্ধভাবের যা কিছু তা সবই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বা অজ্ঞান—সংসারবন্ধনের কারণ। সুতরাং মুমুক্ষু সাধক সকল জ্ঞানবিরোধী বস্তু সযত্নে ও সর্বাগ্রে পরিহার করে মোক্ষলাভের সাধনার উপায়সমূহ

একান্তভাবে অবশ্যকর্তব্যরূপে অবলম্বন করবেন।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥১৩

—যা জানা প্রয়োজন এবং যা জানলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে তা তোমাকে বলব। সেই অনাদি পরম ব্রহ্ম সৎও নন আবার অসৎও নন—এভাবে কথিত হয়ে থাকেন।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীভগবান জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে অর্জুনকে বলেছেন। সেই জ্ঞাতব্য অর্থাৎ জানবার যোগ্য বিষয়টি কী, তা জেনে ফল কী এবং তার স্বরূপই বা কেমন, সে-সম্বন্ধে এখন বলছেন।

এখানে 'জ্ঞেয়ম্' শব্দটি প্রয়োগের তাৎপর্য হল, যা জানা অত্যাবশ্যক এবং এই জ্ঞাতব্যকে জানা সম্ভব। এই সংসারে অসংখ্য বিষয়, পদার্থ, বিদ্যা, কলা ইত্যাদি আছে, যার মধ্যে কোনওটিকে অত্যাবশ্যকভাবে জানতেই হবে এমন বলা যায় না। জানার যোগ্য একমাত্র পরমাত্মাই আছেন। জগতের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কোনও মানুষই নিঃশেষে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। আপ্রাণ চেষ্টা করলেও অধিকাংশ অজ্ঞাতই থেকে যায়।

এই কারণে প্রাচীন ঋষিরা গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন, এমন কোনও বস্তু কি আছে যাকে জানলে সব কিছু জানা যাবে? জড় ও চেতনের যে-বিরাট বৈচিত্র্যময় সমাহার নিয়ে এই জগৎ তার মূল উপাদানটি কী—যার মধ্যে সবকিছু একত্রে বিধৃত হয়ে রয়েছে? মুণ্ডক উপনিষদে শৌনক ঋষি আঙ্গিরসের কাছে এসে জানতে চেয়েছিলেন, ''কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি''—কোন বস্তুকে জানলে সবকিছু বিশেষরূপে জানা যায়? উত্তরে আঙ্গিরস বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানীদের মতে দুরকম বিদ্যা আছে—ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ পরমজ্ঞান আর আপেক্ষিক জ্ঞান অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎসম্পর্কীয় জ্ঞান। জাগতিক জ্ঞান বহুর জ্ঞান, আর ব্রহ্মজ্ঞান একের জ্ঞান—যাকে জানলে সবকিছু জানা যায়। অপরা বিদ্যা বা পার্থিব জগতের জ্ঞান ঐহিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে সাময়িক তৃপ্তি প্রদান করতে পারে কিন্তু তা চিরস্থায়ী শান্তি, আনন্দ দিতে পারে না, বাসনাকে চিরতৃপ্ত করতে পারে না। একমাত্র আত্মজ্ঞানই মানুষকে শাশ্বত শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে। তাই পারমার্থিক জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞাতব্য। এই জ্ঞানলাভ জীবের অতিশয় প্রয়োজন, কেননা তা লাভ করলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করে। পরমাত্মা বিষয়ক এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, ''ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।'' বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, ''ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি''—ব্রহ্মবিদ ব্যক্তির দেহত্যাগের পর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান, তাঁর আত্মা পরব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। এই পরব্রহ্ম 'অনাদিমৎ' অর্থাৎ আদিহীন। তাঁর কোনও আদি কারণ নেই, কেননা তিনি স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ও সর্ববস্তুর কারণ—''সর্বকারণকারণম্।'' তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি বলেছেন, ''যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'' (২।৪) অর্থাৎ বাক্য ও মন তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে। পরব্রহ্মের স্বরূপ তো শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে বোঝানো যায় না, তবুও অর্জুনকে বোঝানোর জন্য শ্রীভগবান কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বলছেন পরব্রহ্ম 'সৎ' নন, কেননা 'আছেন' এই বলে প্রমাণের অতীত; আবার 'অসৎ'ও নন অর্থাৎ 'নেই' এইরকম নিষেধাত্মক প্রমাণেরও অতীত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''ব্রহ্ম যে কী, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয়নি—তা হল ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম যে কী, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি।"

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১৪

—সর্বত্র তাঁর হস্ত ও পদ, সর্বত্র তাঁর চক্ষু, মস্তক, মুখ এবং কর্ণ। তিনি সর্বভূতকে ব্যাপ্ত করে—তাদের অন্তরে ও বাইরে অবস্থান করছেন।

পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা সর্বব্যাপী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র, সমস্ত বস্তু ও প্রাণিবর্গের অন্তরে, বাইরে বিভিন্ন নাম-রূপে তিনি প্রকাশিত। তাঁর নাম, রূপ অনন্ত সুতরাং তাঁর হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ ইত্যাদি সর্বত্র ও সবদিকেই বর্তমান। শ্রুতি বলেছেন, ''একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" (কঠ, ২।২।৯)—এই অদ্বিতীয় সর্বভূতান্তরস্থিত আত্মা সর্বত্র অবস্থিত; ''সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৪) —সেই পরমপুরুষের সহস্র (অনন্ত) মস্তক, সহস্র চক্ষু এবং সহস্র পদ; ''সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)—এই (জগৎ) সমস্তই ব্রহ্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জড়-চেতন যাবতীয় সকল বস্তুতে, সর্বভূতের অন্তরে বাইরে অখণ্ড সত্তারূপে পরমাত্মা আকাশের মতো সর্বত্র ওতপ্রোত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করছেন। সবকিছুই তাঁর সত্তায় সত্তাবান। এই জগৎপ্রপঞ্চে তিনিই একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥১৫

—তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি বা কাজের দ্বারা প্রকাশিত অথচ স্বয়ং ইন্দ্রিয়হীন, তিনি অনাসক্ত, নিঃসঙ্গ অথচ সকলের আধারস্বরূপ। তিনি গুণবর্জিত, গুণাতীত অথচ তিনিই সকল গুণের ভোক্তা।

জীবের সকল ইন্দ্রিয় অর্থাৎ হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মন পরব্রহ্মেরই শক্তিতে প্রকাশমান ও শক্তিযুক্ত। তাঁর শক্তি ছাড়া কেউই নিজের নিজের কাজ করতে পারে না। কঠোপনিষদে দেখা যায়,

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥
(২।৩।৬)

—পঞ্চভূত থেকে পৃথকভাবে ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি। ইন্দ্রিয়গুলি জাগ্রত অবস্থায় সক্রিয় এবং নিদ্রিত অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে। জ্ঞানী জানেন যে আত্মা ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ; আর সেই কারণেই তিনি আর দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

পঞ্চভূতে গঠিত বলে ইন্দ্রিয়গুলি জড়, তাই বিনাশশীল। আত্মা শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু ইন্দ্রিয় জড়। আত্মার ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়সকল কর্মক্ষম হয়। আত্মার শরীর ত্যাগকালে ইন্দ্রিয়গুলি অক্ষত, অটুট থাকলেও কর্মক্ষমতা হারায়। আত্মাকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলি অচল। যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে আত্মা থেকে পৃথকভাবে জানতে পারেন, তিনি ইন্দ্রিয়সংস্পর্শ জনিত সুখদুঃখাদির দ্বারা প্রভাবিত হন না। ''অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯)—তাঁর হাত নেই অথচ গ্রহণ করেন, পদ নেই তবু চলেন, চক্ষু না থাকলেও দর্শন করেন এবং কর্ণ না থাকলেও শ্রবণ করেন। মুণ্ডক উপনিষদেও বলা হয়েছে, তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র (১।১।৬)। পরব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণবর্জিত, তাঁতে কোনও গুণ নেই। তিনি এই তিনগুণের অতীত অথচ জীবচৈতন্যরূপে বিভিন্ন শরীরে গুণসমূহের ভোক্তা এবং সর্বগুণের আধারস্বরূপ। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা কীর্তন করে বলেছেন 'নির্গুণ গুণময়।' সমগ্র বিশ্বচরাচর তাঁকে আশ্রয় করে বর্তমান।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।

সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥১৬

—সর্বভূতের বাইরে ও ভিতরে অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে তিনি (পরব্রহ্ম) আছেন। স্থাবর (চর) এবং জঙ্গমও (অচর) তিনি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলে তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি দূরে আবার নিকটেও অর্থাৎ সর্বত্র এবং সবকিছুতে তিনি বিরাজিত।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু পরব্রহ্ম দ্বারা ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্বত্রই তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। ঈশোপনিষদে দেখা যায়, ''তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'' (৫) অর্থাৎ তিনি এই সবকিছুর বাহ্য ও অভ্যন্তরে বিদ্যমান। এই ধরনের বহু শ্রুতিবাক্য আছে : ''সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম'' (মাণ্ডুক্য ২)—এই (দৃশ্যমান) সমস্তই ব্রহ্ম; ''প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি'' (মুণ্ডক ৩।১।৪)—তিনি সর্বভূতে প্রাণরূপে প্রকাশমান। তিনি এভাবে সর্বত্র ও সবকিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ও নিরাকার, তাই তিনি অবিজ্ঞেয়; কেউ তাঁকে সম্যক্ জানতে পারে না। শ্রুতি বলেন, ''সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং'' (কৈবল্য উপনিষদ ১৬) অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং অবিনাশী। তিনি সর্বব্যাপী সুতরাং কাছে দূরে সর্বত্রই সর্বকালে তিনি আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ সর্ববস্তু চৈতন্যময় বলে অনুভব করেছিলেন। বিবেক-বৈরাগ্যহীন, অসংযমী, অশুদ্ধচিত্ত, অবিশ্বাসী, সাধনভজনহীন ব্যক্তির পক্ষে তিনি অতিদূরে। এরূপ ব্যক্তিগণ তাঁকে ধারণা করতে বা লাভ করতে পারে না। কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্যবান, শমদমাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত, সাধনভজনশীল সাধকের পক্ষে তিনি অতি নিকটে, যেহেতু তাঁর প্রসন্নতা তথা কৃপায় এরূপ সাধকগণ নিজ হৃদয়ে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি বা আত্মদর্শন করে থাকেন। ঈশোপনিষদে অনুরূপ একটি মন্ত্র দেখা যায় : ''তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।/ তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥'' (৫) অর্থাৎ তিনি চলেন আবার চলেন না, তিনি দূরে এবং নিকটেও। তিনি সর্বভূতের অন্তরে এবং বাইরে আছেন। মুণ্ডক উপনিষদ বলছেন, ''দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্'' (৩।১।৭) অর্থাৎ তিনি দূর থেকেও সুদূর, আবার নিকটেও। যাঁরা তাঁর দর্শন করেন, তাঁরা তাঁকে নিজের হৃদয়গুহায় সাক্ষাৎ করে থাকেন।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥১৭

—সেই জ্ঞেয়বস্তু (পরব্রহ্ম) স্বরূপত অবিভক্ত হয়েও সর্বভূতে বিভক্তের মতো পৃথক পৃথক বলে প্রতীত হন। তাঁকে ভূতগণের পালনকর্তা, সংহারকারী ও সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে।

পরমাত্মা এক, অদ্বয় ও অভিন্ন। পৃথক পৃথক নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও স্বভাববিশিষ্ট বিভিন্ন প্রাণিদেহে চিৎশক্তিরূপে তিনি সেই সকলকে প্রকাশমান ও ক্রিয়াশীল করে থাকেন। এই কারণে তিনি এক ও অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিভক্ত বলে মনে হয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে অবয়বশূন্য, নিরংশ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অবিচ্ছিন্ন। আকাশ যেমন গৃহ, ঘট ইত্যাদি দ্বারা (গৃহাকাশ, ঘটাকাশ ইত্যাদিরূপে) পরিচ্ছিন্ন হতে পারে না; এবং জলের মধ্যে ডুবে থাকা ঘট, কলসি ইত্যাদির জল যেমন জলাশয়ের জল থেকে বিভক্ত বা পরিচ্ছিন্ন হতে পারে না, তেমনই পৃথক পৃথক প্রাণিদেহও তাঁকে বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কঠোপনিষদে পাওয়া যায়, ''একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি'' (২।২।১২)—সর্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপে সকলের নিয়ন্তা হয়ে যে-অদ্বিতীয় (আত্মা) এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেছেন, ''একো দেবঃ

সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'' (৬।১১)—একই ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। তিনি ''একমেবা-দ্বিতীয়ম্'' (ছান্দোগ্য ৬।২।১), সেই পরম অব্যয় পুরুষে সব এক হয়ে যায় (''পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি''—মুণ্ডক ৩।২।৭)। এসকল শ্রুতিবাক্যই ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় বলে প্রতিপাদন করেছেন। তিনি সর্বভূতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ। সেই জ্ঞেয়বস্তু পরব্রহ্ম সর্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মারূপে বর্তমান।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥১৮

—তিনি সূর্যাদি জ্যোতিষ্কগণেরও জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি তমোরূপ অজ্ঞানের অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত। তিনিই জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই জ্ঞেয়, এবং জ্ঞানের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। তিনি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু সেই পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান এবং সকলের শক্তির একমাত্র উৎস তিনিই। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, বিদ্যুৎ, অগ্নি ইত্যাদি সমস্ত প্রকাশমান জ্যোতি বা আলোর উৎস সেই পরমাত্মা। ''তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং/ তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥'' (মুণ্ডক ২।২।১০, কঠ ২।২।১৫)—ব্রহ্মের জ্যোতিতেই এই সবকিছু জ্যোতির্ময়। ব্রহ্মের আলোকেই সব আলোকিত। ''আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'' (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮)—তিনি সূর্যের মতো প্রকাশমান এবং অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত।

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে,

''হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ॥৯

অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদ্যাবিহীন এবং নিরাকার। হৃদয়ের জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ কক্ষে তাঁর আবাস। তিনি শুদ্ধ এবং আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। যিনি আত্মাকে জানেন তিনি ব্রহ্মকেও জানেন। এই মন্ত্রটি যেন গীতার বর্তমান শ্লোকটিরই প্রতিধ্বনি। তলোয়ার যেমন কোশ বা খাপের মধ্যে থাকে, তেমন হৃদয়েও ব্রহ্ম লুকিয়ে আছেন। সেইজন্য হৃদয়কে ব্রহ্মের 'কক্ষ' বলা হয়েছে। এই কোশ বা কক্ষকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশেষিত করা হয়েছে; কারণ দেহের অন্তরতম স্থানে এঁর অবস্থান। বর্তমান শ্লোকটিতেও শ্রীভগবান বলছেন যে তিনি জগতের সমস্ত কিছুর প্রকাশক দিব্যজ্যোতিঃস্বরূপ এবং সর্বজীবের অন্তরে হৃদয়গুহায় নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন।

কঠোপনিষদ সেই আত্মার অবস্থান সম্বন্ধে বলেছেন, ''গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।'' তিনিই আবার জ্ঞানস্বরূপ হয়ে জীবের শুদ্ধ নির্মল বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশিত। কঠোর সাধনার দ্বারা শুদ্ধচিত্তে জ্ঞান নিজস্বরূপে প্রকাশিত হন, তখন সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার জ্যোতিতে জীবের সকল অবিদ্যা তথা অজ্ঞান-অন্ধকার চিরতরে দূর হয়ে যায়। এই হল ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। ব্রহ্মের তথা ক্ষেত্রজ্ঞের এই স্বরূপজ্ঞান লাভই মুমুক্ষু সাধকের একমাত্র জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য। উপনিষদে দেখা যায়, ''সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'' (তৈত্তিরীয় ২।১।৩)—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অসীম ও অনন্ত। জ্ঞান ও উপলব্ধির দ্বারা তাঁকে লাভ করা সম্ভব, তিনি জ্ঞানগম্য। ''মনসৈবেদমাপ্তব্যম্'' (কঠ ২।১।১১)—মনের সাহায্যেই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় : ''শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা—এক।'' সাধনার দ্বারা বুদ্ধিকে স্ফটিকের মতো শুদ্ধ ও নির্মল করলে, তাঁর কৃপায় সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মা প্রতিফলিত হন অর্থাৎ আত্মদর্শন হয়। বিবেক-বৈরাগ্যের দ্বারা সদসৎ বিচার অবলম্বনপূর্বক আত্মজ্ঞানলাভ রূপ পরম লক্ষ্য স্থির করে শমদমাদি সাধনসম্পত্তির সাহায্যে ব্রহ্মবিদ গুরুর সান্নিধ্যে নিত্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা মনকে আত্মচিন্তায় একাগ্র ও নিবিষ্ট করতে হয়।

আত্মজ্ঞানলাভের সাধনার এ-পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তা অত্যন্ত দুর্গম, ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে চলার মতো। অমানিত্বাদি সাধনার দ্বারা শুদ্ধ, স্থির, একাগ্র চিত্তে আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। মানব তখন উপলব্ধি করে তার ক্ষেত্র তথা শরীরে স্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা হলেন প্রকৃতপক্ষে সেই পরমাত্মা এবং তিনি শুধু এই শরীরেই নয়, সর্বভূতে বিরাজমান।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥১৯

—এই পর্যন্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্ত এইসকল তত্ত্ব জেনে আমার স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত হন।

শ্রীভগবান এই অধ্যায়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে ক্ষেত্র সম্বন্ধে, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোক অবধি জ্ঞানের সাধন সমুদয় প্রসঙ্গে এবং তেরো থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান শ্লোকে তিনি এই বিষয়ের উপসংহার করছেন।

'মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায়' এই পদগুলির তাৎপর্য এই, পরমাত্মার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিশ্রদ্ধা দ্বারাই এরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং সাধক ভক্তিমান হবেন। শ্রীভগবান বলছেন : ক্ষেত্র, সাধন-সমুদয়রূপ জ্ঞান এবং জ্ঞেয় তত্ত্ব (পরব্রহ্ম) সম্বন্ধে জানলে আমার ভক্ত আমার ভাব প্রাপ্ত হবে। ক্ষেত্রকে এবং সাধনসমুদয়ের জ্ঞান যথাযথভাবে জানলে দেহাভিমান অর্থাৎ দেহে 'আমি' বুদ্ধি দূর হয়—দেহ ও আত্মা দুটি যে পৃথক সেই বোধ স্পষ্ট হয়। মানব তখন আর নিজের শরীর বা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব বা মন-বুদ্ধিকে আঁকড়ে 'আমি-আমার' বোধ করে না। সে তখন উপলব্ধি করে সে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন অর্থাৎ স্বরূপত পরমাত্মাই। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা ঈশ্বরদর্শনই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তথা একমাত্র জ্ঞাতব্য। এখানে 'মদ্ভাব' বলতে শ্রীভগবান তাঁর (পরমাত্মার) ভাগবত সত্তাকে বুঝিয়েছেন।

শ্রীভগবান বলছেন, এইরকম সম্যক্ দর্শনের অধিকারী 'মদ্ভক্ত'। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন। অনাদি, সর্বব্যাপী, সর্বজীবের স্রষ্টা, ধাতা, নিয়ন্তা ও গুরুরূপ পরমেশ্বরকে এমন ভক্ত সর্বাত্মক, একমাত্র আশ্রয় ও গতি বলে নিশ্চিতরূপে ধারণা করবেন। ভগবান সর্বভূতের হৃদয়গুহায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন এই জ্ঞানে ভক্ত সর্বভূতে ও সর্বত্র তাঁকেই দর্শন করে থাকেন। এমন ভক্ত পরমেশ্বরকেই জ্ঞান, একমাত্র জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যবোধে তাঁরই শরণাগত হয়ে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে সর্বদা তাঁরই আরাধনা ও স্মরণ-মননে নিমগ্ন থাকেন। এমন ভক্তিমান সাধকই ভগবদ্ভাব লাভের (তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির) প্রকৃত অধিকারী। প্রসঙ্গত বলা যায়, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হয়েছে, ''যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।/ তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'' (৬।২৩)—দেবের (পরমাত্মার) প্রতি যাঁর পরাভক্তি আছে এবং গুরুর প্রতিও একইরকম ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার অন্তঃকরণেই ভগবৎতত্ত্বের গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হয়। *(ক্রমশ)*